বাংলাদেশের হাঙ্গর, শাপলাপাতা এবং সামুদ্রিক কাছিমের সাথে পরিচিতি

কাস্তে হাঙ্গর
Alopias superciliosus

কাস্তে হাঙ্গর ১৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এদের লেজের উপরের অংশটি শরীরের সমান বা আরও বেশি লম্বা হয়ে থাকে। এরা শিকারকে এক জায়গায় জড়ো করতে এবং ঘায়েল করতে লেজ ব্যবহার করে থাকে। কাস্তে হাঙ্গর ২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং গভীর পানিতে থাকে।

রেশমি হাঙ্গর
Carcharhinus falciformis

চামড়ার মসৃণতার জন্য সরু এই হাঙ্গরের নাম রেশমি হাঙ্গর। এরা ১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। রেশমি হাঙ্গরেরা সাধারণত বড় দলে সাঁতার কাটে এবং মাছের ঝাঁক, বিশেষ করে টুনাজাতীয় মাছের ঝাঁক থেকে শিকার করে খেয়ে থাকে।

খাঁজযুক্ত হাতুড়ি হাঙ্গর
Sphyrna lewini

হাতুড়ির মত চ্যাপ্টা মাথার দুই প্রান্তে এই হাঙ্গরের চোখ দুইটি অবস্থিত। এরা বালির নিচে লুকিয়ে থাকা শিকার যেমন- মাছ, ছোট হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছকেও খুঁজে বের করতে পারে। হাতুড়ি হাঙ্গরেরা সাধারণত বড় দলে সাঁতার কাটলেও একাকী শিকার করে।

ধূসর বাঁশ/বেণু হাঙ্গর
Chiloscyllium griseum

ধূসর বাঁশ হাঙ্গরেরা সাগরের তলদেশে বসবাসকারী সরু দেহবিশিষ্ট হাঙ্গর যাদের গোলাকার ভোঁতা মাথা ও লম্বা লেজ আছে। এরা লম্বায় ২.৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই হাঙ্গরেরা কাঁটাবিহীন ছোট ছোট প্রাণী খেয়ে থাকে। মোহনার কাদাময় তলদেশে এরা উপবৃত্তাকার ডিম পাড়ে যা থেকে বাচ্চাগুলো বের হয়।

গাঙ্গেয় হাঙ্গর
Glyphis gangeticus

মহাবিপন্ন এই গাঙ্গেয় হাঙ্গরেরা বঙ্গোপসাগরের উপরের দিকে নদীর মুখে বা মোহনায় থাকে। এর একটি চওড়া গোলাকার নাক আছে এবং মুখটি পিছনের দিকে চোখ বরাবর বিস্তৃত। পূর্ণবয়স্ক গাঙ্গেয় হাঙ্গরেরা ধূসর বর্ণের এবং ৬ ফুটের মত লম্বা হয়।

তিমি হাঙ্গর
Rhincodon typus

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাছ হল তিমি হাঙ্গর। লম্বায় এরা ৪০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। এদের চামড়াটি অনেক মোটা এবং নীলাভ ধূসর দেহে সাদা রংয়ের ফোঁটা ফোঁটা ও ডোরাকাটা দাগ আছে। তিমি হাঙ্গর এর বিশাল মুখটা খোলা রেখে ধীরে ধীরে সাঁতার কাটে এবং বিশেষ ধরনের ফুলকাকে ছাঁকনি হিসেবে ব্যবহার করে ছোট মাছ ও অন্যান্য ছোট প্রাণী খেয়ে থাকে। এরা ১০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। স্ত্রী হাঙ্গরেরা ৩০ বছর বয়স থেকে বাচ্চা দিতে পারে।

বাঘা হাঙ্গর
Galeocerdo cuvier

বাঘা হাঙ্গরেরা সাধারণত বিশাল আকৃতির হয়, এরা লম্বায় ১৮ ফুট এবং ওজনে ৬০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। কমবয়সী বাঘা হাঙ্গরদের গায়ে সাধারণত কালো ডোরাকাটা দাগ দেখা যায় যা তাদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে হালকা বা ফিকে হয়ে যায়। এদের চোয়াল এত শক্ত যে সাগরের কচ্ছপের খোলসকে গুঁড়ো করে দিতে পারে। এছাড়াও এরা মাছ, সামুদ্রিক পাখি ও ডলফিন খেয়ে থাকে। স্ত্রী হাঙ্গরেরা প্রতি তিন বছরে একবার বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে। মায়ের পেটের ভিতরে ১০ থেকে ৮০টি বাচ্চা ডিম ফুটে বের হয় এবং পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সেখানে একবছরেরও বেশি সময় ধরে থাকে।

কালোডগা হাঙ্গর
Carcharhinus limbatus

কমবয়সী কালোডগা হাঙ্গরের সবগুলো পাখনার প্রান্ত কালো থাকে, কিন্তু পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে এই প্রান্তগুলো ফিকে হয়ে যায়। এরা লম্বায় ৫ ফুট পর্যন্ত হয় এবং সাধারণত নদীর মুখে, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় অগভীর পানিতে থাকে।

কোদালনাক হাঙ্গর
Scoliodon laticaudus

কোদালনাক হাঙ্গরের লম্বা, চ্যাপ্টা ও তিনকোণা নাক আছে। খুব ছোট ও তিনকোণা পাশ বা বুক পাখনাবিশিষ্ট এই ছোট আকারের হাঙ্গরগুলোর ২ থেকে ৩ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। প্রতি ছয় মাস পর পর স্ত্রী হাঙ্গরেরা সাধারণত ৬ থেকে ১৮ টি বাচ্চা দিয়ে থাকে। সাধারণত এদেরকে অগভীর পানিতে বড় বড় দলে দেখা যায়।

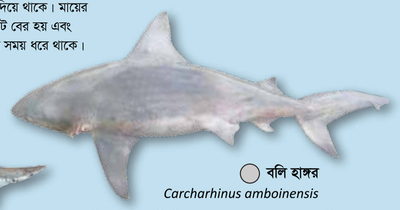

বলি হাঙ্গর
Carcharhinus amboinensis

বলি হাঙ্গর একটি বিশাল আকারের হাঙ্গর যার একটি বড় মাথা, ছোট ছোট চোখ এবং খাটো, চওড়া ও ভোঁতা নাক আছে। প্রথম পিঠ পাখনাটি উচ্চতায় দ্বিতীয় পিঠ পাখনার থেকে তিনগুণেরও বেশি হয়ে থাকে। এরা ৯ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। বলি হাঙ্গরেরা উপকূলীয় ও মোহনার অগভীর পানিতে থাকে। এরা অন্যান্য হাঙ্গর ও শাপলাপাতাসহ নানা ধরনের মাছ খেয়ে থাকে।

কালোডগা বলি হাঙ্গর
Carcharhinus leucas

বিশাল আকারের কালোডগা বলি হাঙ্গরের নাকটি খাটো ও ভোঁতা এবং চওড়ায় মুখের চেয়ে ছোট হয়। এরা লম্বায় ১১ ফুটের মত হয়ে থাকে। এই হাঙ্গরেরা উপকূলীয় ঘোলা ও ঈষৎ লোনাপানিতে থাকে। হাঙ্গরদের মধ্যে এরাই একমাত্র প্রজাতি যারা উজানে অনেকদূর পর্যন্ত যেতে পারে ।

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ দ্বারা হত্যা, অধিকরণ ও বানিজ্য থেকে সুরক্ষিত

CITES দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে সুরক্ষিত

বিপন্ন প্রজাতি **IUCN** রেড লিস্ট অনুযায়ী সংরক্ষন অবস্থা

তথ্যের অভাব | প্রায় সঙ্কটাপন্ন | সঙ্কটাপন্ন | বিপন্ন | মহাবিপন্ন

WE STAND FOR WILDLIFE[SM]

আমাদের সমুদ্রের মহাকায় প্রাণীরা বিপদাপন্ন

হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ, সামুদ্রিক কচ্ছপ এবং সেইসাথে ডলফিন ও তিমিরা আমাদের সমুদ্রের মহাকায় বা বৃহৎ প্রাণী। এই মহাকায় প্রাণীরা সামুদ্রিক পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য অপরিহার্য। আমরা আমাদের খাবার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজের জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল। সামুদ্রিক এই মহাকায় প্রাণীরা যদি হারিয়ে যায় তাহলে আমরাই সমস্যায় পড়ব। যদিও এদের সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই অজানা রয়েছে কিন্তু এতটুকু আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি মৃত নয়, বরং জীবিত অবস্থাতেই এরা বেশি মূল্যবান।

সমুদ্রের মহাকায় প্রাণীদের সুরক্ষা

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইন এই মহাকায় প্রাণীদের আইনী সুরক্ষা প্রদান করেছে। ভৌগোলিক সীমারেখায় বিপন্ন প্রাণীদের পাচার নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সমুদ্রের এই বিশাল আকারের প্রাণীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু এলাকাকে **"সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা"** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে যেন এই প্রাণীরা এবং তাদের খাবার (মাছেরা) নিরাপদে থাকতে পারে। সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকাসমূহ মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই প্রাণীদের পাশাপাশি আমাদেরও উপকার করছে। শুধুমাত্র আইন নয়, এর পাশাপাশি আপনার-আমার সহযোগিতাই পারে এদের সংরক্ষণ করতে।

জালে আটকা পড়া ডলফিন, হাঙ্গর, শাপলাপাতা মাছ ও কচ্ছপকে ছেড়ে দিন।

অপরিণত মাছ বা কাঁকড়া ধরবেন না বা কিনবেন না।

কচ্ছপের ডিম পাড়ার জায়গাগুলো রক্ষা করুন।

প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে দিন।

ডলফিন, কচ্ছপ বা আইনত সুরক্ষিত হাঙ্গর বা শাপলাপাতা মাছ ও এদের শরীরের কোন অংশ খাবেন না বা কেনা-বেচা করবেন না।

সমুদ্রের এই প্রাণীদের সম্পর্কে আপনি যা জানেন তা অন্যদেরকে জানান এবং এদের সংরক্ষণে অন্যদেরকে উৎসাহিত করুন।

ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান, সংরক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম দ্বারা মানুষকে প্রকৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী এবং এদের বাসস্থান রক্ষার কাজ করে আসছে।

স্থানীয় জেলে সম্প্রদায় এবং সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করার মাধ্যমে ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, বিশ্বের অন্যতম বিপন্ন সামুদ্রিক প্রাণীদেরকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে কার্যকর সমাধান প্রদানের চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশে সিটিজেন সায়েন্স ফিসারম্যান সেফটি নেটওয়ার্কের সদস্যরা তাদের জালে আটকা পড়া ডলফিন, কচ্ছপ বা মহাকায় প্রাণীদের ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি প্রচলিত পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ধরা পড়া মাছ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করছে। বিনিময়ে ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, তাদেরকে সাগরে নিরাপদে চলাচলের জন্য জিপিএস এবং এর ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্যবহার করে স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের উপকারের পাশাপাশি সামুদ্রিক প্রাণীদেরকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম একটি বিজ্ঞান-সম্মত পরিকল্পনা তৈরির কাজ করে যাচ্ছে।

শাপলাপাতা

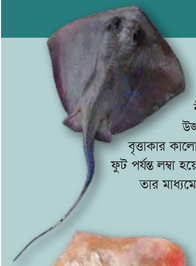

নীলফোঁটা শাপলাপাতা
Neotrygon kuhlii

নীলফোঁটা শাপলাপাতা মাছের গায়ে উজ্জ্বল নীল বর্ণের এবং এর লম্বা লেজে বৃত্তাকার কালো ও সাদা ফোঁটা আছে। এরা প্রায় ২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এর লেজে যে কাঁটা রয়েছে তার মাধ্যমে ব্যথাদায়ক ক্ষত বা ঘাঁ হতে পারে।

মৌচাক বা চিত্রা শাপলাপাতা মাছের গায়ে স্পষ্ট কালো ফোঁটা এবং সরু লেজে সাদা ও কালো ব্যান্ড বা বৃত্ত থাকে। পাঁচ ফুট চওড়া শরীর থেকে এর লেজটি প্রায় তিনগুণ লম্বা হয়ে থাকে। এরা সাধারণত মোহনার অগভীর পানিতে বাস করে এবং বছরে ৩ থেকে ৫টি বাচ্চা দিয়ে থাকে।

মৌচাক বা চিত্রা শাপলাপাতা
Himantura uarnak

চিতা শাপলাপাতা মাছের গায়ে চিতা বাঘের মতই ফোঁটা ফোঁটা আছে। এই বড় শাপলাপাতা মাছেরা চওড়ায় ৪.৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদেরকে সাধারণত উপকূলীয় জলরাশির কাদাময় তলদেশে এবং সম্ভবত ম্যানগ্রোভ বনের খালে পাওয়া যায়।

চিতা শাপলাপাতা
Himantura leoparda

মহাকায় মিঠাপানির শাপলাপাতা
Urogymnus polylepis

মহাকায় মিঠাপানির শাপলাপাতা পৃথিবীর মিঠাপানির মাছগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। এরা প্রায় ৬.৫ ফুটের মত চওড়া এবং ওজনে ৬০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের খাঁজওয়ালা কাঁটাটি লম্বায় ১৫ ইঞ্চি হয়ে থাকে। এই বিশাল আকারের শাপলাপাতা মাছগুলো বড় নদী ও মোহনার কাদাময় তলদেশে বাস করে।

চাবুকলেজী শাপলাপাতা
Pateobatis uarnacoides

চাবুকলেজী শাপলাপাতা মাছেরা চওড়ায় ৪ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের আলাদা কোন চিহ্ন বা দাগ নেই। এদেরকে সাধারণত উপকূলীয় ও মোহনা এলাকায় দেখা যায়।

লম্বালেজী প্রজাপতি শাপলাপাতা
Gymnura poecilura

লম্বালেজী প্রজাপতি শাপলাপাতা মাছের লেজে ৯ থেকে ১২ টি পর্যায়ক্রমিক কালো ও সাদা ব্যান্ড বা পট্টি থাকে। এরা চওড়ায় সাধারণত ৩ ফুট পর্যন্ত বড় হয়ে থাকে এবং লম্বার তুলনায় চওড়ায় দ্বিগুণ হয়ে থাকে। এরা উপকূলীয় অগভীর জলরাশির কাদাময় তলদেশে অবস্থান করে।

চোখানাক শাপলাপাতা
Telatrygon crozieri

চোখানাক শাপলাপাতা মাছেরা একফুটের মত বড় হয়ে থাকে। স্ত্রী শাপলাপাতা মাছেরা বছরে ১ থেকে ৩ টি বাচ্চা দিয়ে থাকে। ছোট আকারের এই শাপলাপাতা মাছেরা মোহনা ও উপকূলীয় এলাকায় অনেক বেশি পরিমাণে ধরা পড়ার কারণে ভীষণ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

বঙ্গীয় শাপলাপাতা
Brevitrygon imbricata

ছোট আকারের বঙ্গীয় শাপলাপাতা মাছ লম্বা ও চওড়ায় প্রায় সমান হয়ে থাকে, অন্যদিকে এর লেজ শরীরের তুলনায় খাটো হয়ে থাকে। এদের নিচের দিকটা সম্পূর্ণ সাদা। কমবয়সী এই শাপলাপাতা মাছেরা ম্যানগ্রোভ বনের জলাভূমিতে থাকলেও পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় এরা উপকূলীয় এলাকায় চলে যায়।

ধনুকমুখী পাতাখরী
Rhina ancylostoma

বড়দাঁত মিঠাপানির করাত মাছ
Pristis pristis

করাত মাছেরা চওড়া পার্শ্বপাখনা বিশিষ্ট শাপলাপাতা মাছ। এদের লম্বা-চ্যাপ্টা করাতের মত ঠোঁটের দুই পাশ থেকে দাঁতের মত অংশ বের হয়ে থাকে। এই করাতকে এরা কাদাময় তলদেশে লুকিয়ে থাকা ছোট ছোট প্রাণী খুঁজে বের করতে, শিকারকে অচেতন করতে এবং আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করে থাকে। এদের আসল দাঁত শরীরের নিচের দিকে অবস্থিত ছোট্ট মুখের ভিতরে থাকে। করাত মাছ লম্বায় ১৬ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরা ৩০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে এবং ১০ থেকে ২০ বছর বয়সে বাচ্চা দিয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন যে, করাত মাছের মাংস অসুখ সারাতে পারে কিন্তু তা সত্য নয়। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হুমকিতে থাকা প্রাণীদের মাঝে করাত মাছ অন্যতম।

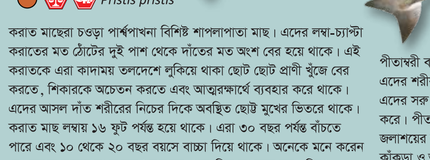

ভোঁতানাক বাদুড় / চোয়াইন
Rhinoptera javanica

ভোঁতানাক বাদুড় / চোয়াইন এর মাথার সামনে বা কপালে খাঁজ আছে। চওড়ায় এরা ৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। শরীরের উপরের দিক বাদামি এবং নিচের দিক সাদা রংয়ের হয়ে থাকে। এরা ঘোলা অগভীর মোহনা, ম্যানগ্রোভ এবং উপকূলীয় জলাশয়ে বাস করে। এদের প্রজনন ধীরগতি সম্পন্ন এবং এরা অল্প সংখ্যায় বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে।

চোখানাক পাতাখরী
Glaucostegus granulatus

বাদুড় / শিং চোয়াইন
Mobula mobular

ঈগল বাদুড় / চোয়াইন
Aetobatus ocellatus

ঈগল বাদুড় / চোয়াইন মাছের কালো বা নীলাভ পিঠে সাদা সাদা ফোঁটা থাকে। চাবুকের মত লেজের গোড়ার কাছে বড় কাঁটা থাকে। এরা চওড়ায় ১১ ফুটের মত হয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী মাছেরা একবছর ধরে গর্ভাবস্থায় থাকে এবং প্রতিবারে সর্বোচ্চ চারটি বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে।

অন্যসব বাদুড় / শিং চোয়াইন এর মত, কাঁটাযুক্ত বাদুড় / শিং চোয়াইন মাছের শরীর হীরার আকারের মত এবং এদের পাখির মত পাখনা এবং পাঁচজোড়া ফুলকা-ছিদ্র আছে। এই শাপলাপাতা মাছেরা চওড়ায় ১০ ফুটের মত হয়ে থাকে এবং প্রতিবারে মাত্র একটি বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে। মাথার সামনের দিকে শিং-য়ের মত অঙ্গ থাকে যা মুখের ভিতরে পানি ঢুকাতে সাহায্য করে। এরা পানির ভেতর থেকে ছোট মাছ এবং অন্যান্য ছোট প্রানীদেরকে মুখের মধ্যে ছেঁকে খেয়ে নেয়।

বাঁকাপাখানা বাদুড় / শিং চোয়াইন
M. thurstoni

খাটোপাখানা বাদুড় / শিং চোয়াইন
M. kuhlii

সাগর কাছিম

সাগর কাছিমেরা পানির নিচে প্রায় ৫ ঘন্টা পর্যন্ত থাকতে পারে তবে ঠিক মানুষের মতই ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বাস নেওয়ার জন্যে পানির উপরে উঠতে হয়। সামনের লম্বা পা জোড়া দেখতে ডলফিনের পাখনার মত যা তাদের সাঁতার কাটতে এবং ডুব দিতে সহায়তা করে।

অন্যান্য কাছিমের মত সাগর কাছিমেরা তাদের মাথা ও পাজোড়া শক্ত খোলসের ভেতরে ঢুকাতে পারেনা। এদের কোনো দাঁত থাকেনা কিন্তু শক্ত ঠোঁট দিয়ে তারা সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং প্রানী যেমন- জেলীফিশ, স্কুইড, ছোট মাছ, কেঁচো, কাঁকড়া, শামুক, চিংড়ি এবং বিনুক খেয়ে থাকে। আর এইসব প্রানী খাওয়ার মাধ্যমে সাগর কাছিমেরা সমুদ্রের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

স্ত্রী কাছিমেরা বছরে একবার তীরে আসে যেখানে তারা নরম বালিতে ডিম পাড়ার জন্যে গভীর গর্ত করে একটি বাসা তৈরি করে। যেখানে তারা জন্মেছিল ঠিক সেই জায়গাতেই ডিম পাড়ার জন্যে ফেরত আসে। সামুদ্রিক কাছিমের ডিমগুলো দেখতে গোলাকার এবং আকারে মুরগীর ডিমের মত হয়ে থাকে কিন্তু উপরে নরম খোলস থাকে।

তবে দুঃখের বিষয় হলো সামুদ্রিক এই কাছিমেরা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। মাছ ধরার জালে আটকা পড়ে অথবা পানির নিচে ভেসে থাকা পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগকে ভুলবশত জেলীফিশ ভেবে খেয়ে হাজার হাজার কাছিম মারা যায়। এছাড়াও সমুদ্রতীরগুলোয় বিভিন্ন দালানকোঠা বা অবকাঠামো গড়ে উঠার কারণে এদের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, এবং বন্যপ্রাণীরাও বিশেষভাবে কুকুরগুলো এদের অরক্ষিত ডিমগুলো চুরি করছে।

জলপাই রঙা সাগর কাছিম
Lepidochelys olivacea

সকল সামুদ্রিক কাছিমের মধ্যে জলপাই রঙা সাগর কাছিমেরা সবচেয়ে ছোট এবং আমাদের বঙ্গোপসাগরে সহজেই পাওয়া যায়। এর হৃৎপিন্ডাকার খোলস একটি ছাতার চেয়ে কিছুটা ছোট হয়ে থাকে। এই প্রজাতির কাছিমেরা আমাদের উপকূলবর্তী বালুকাময় তীরে বাসা করে থাকে। পরিপূর্ণ আকারের কাছিমেরা সাধারণত মুক্ত সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়ায় এবং যেসব সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণী সাধারণত পানিতে আগাছা এবং আবর্জনা হিসেবে ভাসমান থাকে সেগুলো খেয়ে থাকে।

সবুজ সাগর কাছিম
Chelonia mydas

সবুজ সাগর কাছিমেরা সাধারণত ওজনে ৩০০ কেজিরও বেশি হয়ে থাকে এবং প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। ২৫ বছর বয়স হতে, প্রতি ২-৪ বছর পর পর তারা ডিম পাড়ে। তাদের ৫ ফুট লম্বা, মসৃণ খোলস দেখতে অনেকটা অশ্রুবিন্দুর মত। সবুজ কাছিম অন্য যেকোনো সামুদ্রিক কাছিমের তুলনায় অনেক বেশি সময় পানির নিচে ডুব দিয়ে থাকতে পারে। এরা সাধারণত কক্সবাজার থেকে টেকনাফের কিছু উপকূলীয় এলাকায় বাসা করে থাকে।

ঈগলঠুটী সাগর কাছিম
Eretmochelys imbricata

ঈগলঠুটী সাগর কাছিমেরা তাদের পাখির মত শক্ত আংটাযুক্ত ঠোঁটের মাধ্যমে খাবার ধরে এবং কামড়ে খায়। তাদের খুব সুন্দর রঙ্গীন খোলস রয়েছে যা প্রায় ৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সাধারণত এদের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বাসা তৈরি করতে দেখা যায় ।

ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি যেসব ল্যান্ডিং সাইট থেকে হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো মানচিত্রে দেখানো হয়েছে।

হাঙ্গরেরা একধরনের মাছ যাদের শক্ত চোয়াল কিন্তু নরম হাড় (তরুণাস্থি নির্মিত কঙ্কাল) রয়েছে। এদের হাড় আমাদের নাক ও কানের নরম হাড়ের মত। তাদের শক্ত পাখনাগুলো ভাঁজ হয়না, এছাড়া অন্যান্য মাছের মত এদের বায়ুথলিও থাকেনা। হাঙ্গরেরা মুখ খুলে পানিতে সাঁতার কাটে যেন ফুলকার মধ্য দিয়ে পানি বের করে দিতে পারে। তাই ভেসে থাকা এবং নিশ্বাস নেয়ার জন্য বেশিরভাগ হাঙ্গরের সবসময় সাঁতার কাটতে হয়। হাঙ্গরেরা খুবই শক্তিশালী শিকারী, যারা গন্ধ শুঁকে, দেখে, স্পর্শ করে এবং শব্দ শুনে অনেক দূরের শিকারকে শনাক্ত করতে পারে।

হাঙ্গরেরা প্রধানত আহত, অসুস্থ বা দুর্বল মাছ খাবার হিসেবে খেয়ে থাকে কারণ এদেরকে ধরা তুলনামূলক সহজ। এর মাধ্যমে হাঙ্গর অন্যান্য মাছের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে এবং নদী ও সাগরের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে। হাঙ্গরের অনুপস্থিতিতে আমরা অনেক মূল্যবান মাছও হারিয়ে ফেলবো। অতিমাত্রায় ধরা ও বিক্রির কারণে হাঙ্গর খুব দ্রুতই হারিয়ে যাচ্ছে। হাঙ্গরের পাখনা প্রধানত চীনের মানুষেরা স্যুপ হিসেবে খেয়ে থাকে যদিও বাংলাদেশের কোথাও কোথাও হাঙ্গরের মাংস খাওয়া হয়ে থাকে।

হাঙ্গরের সাথে শাপলাপাতা মাছের অনেক মিল আছে। হাঙ্গরের মত এদের কঙ্কালও নরম হাড় বা তরুণাস্থি দ্বারা তৈরি। এদের চ্যাপ্টা দেহের দু'পাশে চওড়া পাখনা রয়েছে যা তাদের মাথার সাথে যুক্ত। তারা পানির মধ্যে পাখির ডানার মত পাখনা ঝাপটে সাঁতার কাটে। এদের চোখ জোড়া একেবারে মাথার চূড়ায় অবস্থিত এবং ফুলকাগুলো নিচের দিকে থাকে। নিঃশ্বাসের জন্য, অধিকাংশ শাপলাপাতাই চোখের পেছনে অবস্থিত দু'টি বিশেষ ছিদ্র দ্বারা পানি গ্রহণ করে এবং তা ফুলকা দিয়ে বের করে দেয়।

শাপলাপাতা মাছ প্রধানত উপকূলীয় পানিতে বসবাস করলেও কিছু মিঠাপানিতে এবং কিছু লোনা ও মিঠা উভয় পানিতেই থাকতে পারে। তারা এমন ধরণের শিকারী যাদের বিশেষ ধরণের দাঁত রয়েছে যা খাবার আঁকড়ে এবং কামড়ে ধরতে সহায়তা করে। এরা সাধারণত কাঁকড়া, ঝিনুক, কেঁচো, শামুক, এবং অন্যান্য তলদেশের মাছকে খাবার হিসেবে খায় যাদেরকে তারা কর্দমাক্ত ও বালিময় তলদেশ থেকে খুঁজে বের করে। হাঙ্গরের মত এদেরও তীব্র ঘ্রাণশক্তি রয়েছে যা তাদের শিকার খুঁজে বের করতে সহায়তা করে। শাপলাপাতা মাছ আমাদের সমুদ্রকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে সহায়তা করে যেন সাগরের তলদেশে শেলফিস অথবা ক্ষুদ্র জীব অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি না পায়।

শাপলাপাতা মাছ সমগ্র পৃথিবীব্যাপীই বিপন্ন একটি প্রজাতি। বাংলাদেশে অসংখ্য পরিমাণে শাপলাপাতা মাছ মারা যাচ্ছে এবং বেচাকেনা হচ্ছে কারণ কিছু মানুষ এদের খায়, আবার কেউ ওষুধ বানানোর কাজে ব্যবহার করে। আবহাওয়াগত পরিবর্তন এদের খাবারের উপর প্রভাব ফেলছে। বিশেষত মিঠাপানির শাপলাপাতা এবং করাত মাছ তাদের আবাসযোগ্য স্থানের অভাবে অধিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ আমাদের পৃথিবীতে যেসব প্রাণীরা আজ বিপন্ন তাদের মাঝে অন্যতম। এরা খুব ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং কম সংখ্যক বাচ্চা উৎপাদন করে থাকে। এর মানে হল, অন্যান্য মাছের তুলনায় হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের সংখ্যা অনেক কম।